পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

নিসর্গসূত্র, দৃশ্যনেশা, স্মরণযোগ্যতা ও বিষয়হীনতার বিপক্ষে

বাংলা বা ভারতীয় বলে নয়, মোটামুটিভাবে গোটা এশিয় কবিতার এক বড়ো ঐতিহ্য নিসর্গসূত্রী বা প্রকৃতিকেন্দ্রিক ভাবনা। কবিতায় যে ভাব, আবেগ, যুক্তি, জীবনদর্শন ইত্যাদির পদচিহ্ন, সবই নিসর্গের কার্পেটের ওপর। কবিতায় ব্যবহৃত রূপক বা উপমার অনেকটাই আজো নৈসর্গিক অথবা প্রকৃতিধর্মী। কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যারা নিয়মকে প্রমাণ করে, শিরোধার্য করে। ধরা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণীয় কিছু পঙক্তি –

‘এবার হয়েছে সন্ধ্যা
সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাড়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো
শালের জঙ্গলে’

বা বিনয় মজুমদার যখন লিখছেন –

‘আমার বাতাস বয়; সদ্যোজাত মরুভূমি থেকে
কেবলই বালুকা ওড়ে; অবাঞ্ছিত পিপাসা বাড়ায়।
তাঁবু নিয়ে ফিরে আসি বন্দরের পরিশ্রান্ত ভিড়ে’

অথবা উৎপল কুমার বসুর বহু-উল্লিখিত ‘এই সংগ্রহের শেষ কবিতা’ –

‘তারপর ঘাসের জঙ্গলে প’ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্টপাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে’

এমনকি শঙ্খ ঘোষ যখন ১৯৫০-এর দশকে লিখছেন –

‘হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।
আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল – দীর্ঘ
করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস-
ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,
আমাকে গোপন করো তুমি।’

কাব্যভাবনার রথের প্রধান সারথি হিসেবে আমি তো নিসর্গ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাই না।

পাশাপাশি বাংলা কবিতার স্বভাবের অনেকটাই দৃশ্যধর্মী। 'বর্ণনা', 'বন্দনা', ও 'বিবরণ'-এর জন্য বরাদ্দ এক উঁচু সিংহাসন। শুধু যে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কনচিত্ররূপী কবিতাগুলো সাধারণভাবে বাঙালীমনে চিরস্থায়ী তাই নয়, রবি যাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন তাঁরও অনেকটাই। আঞ্চলিকতাকে আন্তর্জাতিকতার পাশাপাশি রেখে দেখাটাই বিশ্ববীক্ষা। আর সেভাবে, খুব নিরপেক্ষ হয়ে দেখলে, আধঘন্টা নিজের বাঙালিত্ব ভুলে গিয়ে দেখলে, এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে 'রূপসী বাংলা'র কবিতায় ওই ব-ত্রয়ী – বর্ণনা, বন্দনা আর বিবরণ ছাড়া খুব বেশি কিছু নেই। একটা ঐতিহাসিকতা আছে ঠিক, ল্যান্ডস্কেপ বা ভূদৃশ্যে একটা কালিকতা জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক, কিন্তু তার জমি খুব জোরালো নয়। আবেগধর্মী। এ প্রসঙ্গে আবার মনে করাবো যে এমে সেজেয়ার, বা এজরা পাউন্ড কি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, জর্জ অপেন, রাইনর মারিয়া রিলকে, ডাব্লু এইচ অডেন, আন্তনিও মাচাদো প্রভৃতি বিশ শতকের প্রথম-সিকির কবিদের ভূদৃশ্যিক কবিতার পাশে রেখে পড়লে এমন মনে হতে বাধ্য। আস্ত বই না থাকলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তরও কিন্তু ভূদৃশ্যিক কবিতা আছে, জনমানস যার কোনো কদর করেনি। জমি বা ভূদৃশ্য কখনো একটা মানসিক অবস্থার রূপক হয়েছে, কখনো কালের – কিন্তু এতদিন পর এইসব ব্যবহার খুব প্রথাগত, বহু-ব্যবহৃত মনে হয়। অথচ সিংহভাগ বাংলা কবিতা এই সমস্ত প্রকাশপদ্ধতির ওপরে আজো দাঁড়িয়ে।

সাধারণ অর্থে 'স্মরণযোগ্যতা' বলতে এই ধরনের ব্যবহারকেই বোঝানো হয় বাংলা কবিতায়। এমন কিছু পংক্তি বা শাব্দিক অভিব্যক্তি যা দেখা/জানা সত্যকে/দৃশ্যকে রেটরিকে ভিন্নরূপ দিচ্ছে মাত্র। ভিন্ন একটা ব্যঞ্জনা দিচ্ছে, একটা সূক্ষ্ম ডিপার্চার কখনো, কখনো এমনকি তাও নয়। একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। যেন দুটো লোক একই পদ্মপুকুরের ছবি তুলে নিয়ে গেলো, একটায় শতদল কোলগেট সাদা, অন্যটায় নীল আলোর আভামাখা। ওইটুকুই। এই শাব্দিক/আভিব্যক্তিক যাদুকেই আমরা মোটামুটি 'স্মরণযোগ্যতা' বলি। যা ভাষার কায়দা মাত্র। বোধের, দর্শনের, চিন্তা ও বিশ্লেষণের নয়।

এর পাশাপাশি দেখা যাক জমি বা ভূদৃশ্য নিয়ে আর একজনের লেখা। বিশ শতকে বিলিতী কবিদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে পরীক্ষামূলক বলা হয়, যিনি এই একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় তরুণতর কবিদের কাছে বিশেষ সম্মান দাবী করতে শুরু করেছেন। অসম্ভব প্রচারবিমুখ এক কবি, যিনি এই সেদিনও নিজের ছবি তুলতে দিতেন না, নিজের কবিতা পাঠের রেকর্ডিং করতে দিতেন না, ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় নরম হচ্ছেন। ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে সেই জেরেমি প্রিন লেখেন -

> We owe that in theory to the history of person
> as an entire condition of landscape – that
> kind of extension, for a start.
>
> (First Notes of Daylight)

ভূদৃশ্যের অবস্থা, জমির বর্ণনাই যেন ভূমিষ্ঠের গোটা ইতিহাসের চেহারা। এইরকম একটা তত্ত্ব গড়ে নিয়ে কবিতাভাবনার শুরু। জেরেমি প্রিনের ভূ-সত্তা কিন্তু এর গভীর এক এক জায়গায়। ভূবিজ্ঞান বা জিওলজি নিয়ে কবির এক অনন্ত কৌতূহল। ভূতাত্ত্বিক কাল বা geological time ওঁর বহু কবিতায় সরাসরি এসেছে। উদাহরণ–

We are rocked
in this hollow, in the ladle by which
the sky, less cloudy now, rests on our
foreheads. Our climate is maritime, and
“it is questionable whether there has yet been
sufficient change in the marine faunas
to justify a claim that
the Pleistocene Epoch itself
has come to an end.” We live in that
question, it is a condition of fact: as we
move it adjusts the horizon: belts of forest,
the Chilterns, up into the Wolds of Yorkshire.

(The Glacial Question, Unsolved)

এক শান্ত, সুন্দর ভূদৃশ্য থেকে কীভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরাসরি প্রপঞ্চবিজ্ঞানে চলে যাওয়া যায়, কীভাবে এক প্যাস্টোরাল বা প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যকে কখনো এক বৃহত্তর রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপট করে তোলা যায় তার আরো বহু উদাহরণ প্রিনের কবিতায় রয়েছে। একটা নমুনা –

Now the willows on the river are hazy like mist
and the end is hazy like the meaning
which bridges its frozen banks. In the field
of view a prismatic blur adds on
rainbow skirts to the outer leaves.
They appropriated not the primary
conditions of labour but their results;
the waters of spring cross under
the bridge, willow branches dip.
The denial of Feudalism in China
always leads to political errors, of an
essentially Trotskyist order:
Calm is all nature as a resting wheel.
The red candle flame shakes.

(The Oval Window)

আমায় এক তরুণ কবি এই কবিতা পড়ে সম্প্রতি বলেছিলেন – ‘এতো অনেকটা মণিভূষণের কবিতার মতো’। কথাটা আলগোছের হলেও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। মণিভূষণের কবিতার মধ্যেও প্রকৃতির ছবির ভেতরে বড় জগত ও নাগরিক (বিশেষত রাজনৈতিক) বাস্তবতার জোরালো একটা হুঁশ পোঁতা আছে খুঁটির মতো। কিন্তু প্রিনের আগ্রহের জায়গাগুলো বৃহত্তর – কেবল রাজনীতি নয়, সমাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞান, গণিত, সঙ্গীত ইত্যাদি। এছাড়াও প্রিন

তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডায়নামিক্স নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন, কখনো সরাসরি গাণিতিক সমীকরণও ব্যবহার করেছেন কবিতায়। ইতিহাস, রাজনীতি ও সমকালীন অর্থনীতিতত্ত্ব ছাড়াও জীববিজ্ঞান, প্রপঞ্চবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান থেকে অনবরত ভাবনাচিন্তার আমদানী ঘটেছে। একইসঙ্গে লিরিক, ছন্দ, প্যাটার্ন, নকশা বা বৃহত্তর অর্থে কাঠামোগত আগ্রহ সমানভাবে ফুটে ওঠে ওঁর কর্মকান্ডে। এসবের থেকেই একটা বহুলতা ওর কবিতার শরীর ধরে দ্রুত উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে এমনই আষ্টেপৃষ্ঠে যে এক এক সময় সে লতার পেছনের বাড়িটাকে অনেক সময় দেখা যায় না।

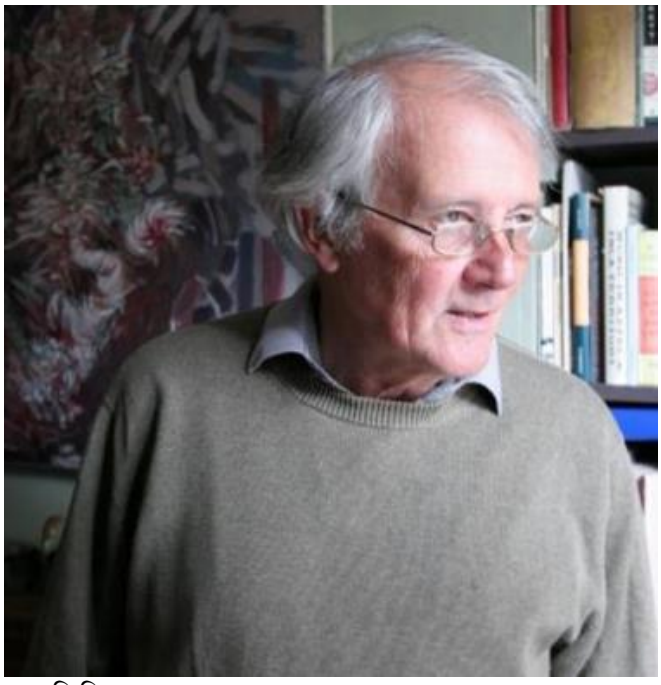

জেরেমি প্রিন

কাজেই দৃশ্যের বা ছবির নেশা কবির আঙুলে নিশ্চয় থাকুক, কিন্তু আগামীকালের কবিত্বের বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে দৃশ্যের স্প্রিংবোর্ড থেকে লাফ দিয়ে কতোটা জমি টপকে যেতে পারছেন কবি। সাঁতারপুলের জলে পড়ার আগে আকাশজমির কতোটা দৃশমানতা তাঁর নজরে ও আয়ত্বে আসছে। সেটাই হয়ে দাঁড়াবে মানদন্ড।

একুশ শতকের গোড়া থেকে, কি বলা যায় ১৯৯০-এর শেষ থেকে, মূলত উত্তরাধুনিক সচেতনতার বিস্তার থেকে, পাশ্চাত্য উত্তরাধুনিকতার সংজ্ঞাকে অনেকটাই আধবুঝে, বাংলা কবিতা থেকে 'বিষয়'কে ঘাড়ধাক্কা দেবার প্রয়াস শুরু হয়। কথা হচ্ছে 'বিষয়' বলতে কীই বা ছিলো বাংলা কবিতায়? ভারীচিন্তা, গুরুভাবনা, জ্ঞানতাত্ত্বিক বা জ্ঞানশাখিক ভাবনা, তথ্যবিশ্লেষণী বা তথ্য/জ্ঞান-সম্পাদ্য ভাবনা, বা নন্দনতত্ত্বের নানা সংশয় বাংলা কবিতায় কবেই বা জায়গা পেয়েছে? যাঁরা অল্পবিস্তর কাজ করার চেষ্টা করেছেন নানা কারণে কর্পূর হয়ে গেছেন – এই ধারার প্রতি, নন-লিরিকাল বুদ্ধিজীবিতার প্রতি বাঙালীর আগ্রহ কম – বুদ্ধিজীবিতা মানেই তাকে সমাজ-রাজনৈতিক সচেতনতার আঁচে ঝালিয়ে নিতে হবে – অন্য জ্ঞানশাখিক বুদ্ধিজীবিতাকে তারা অগ্রাহ্য করেছে, তদুপরি এই অল্পবিস্তর কবিদের অনেকেরই হয়তো কাব্যপ্রতিভা কম ছিলো, বা নতুন ভাবনা কবিতায় এনেও তারা হয়তো কাব্যসাহিত্যের অন্যান্য প্রথা থেকে

বেরতে পারেননি, দুর্বল ভাষা, অতিরিক্ত বিষয়মুখিনতা, লিরিকের ভয়াবহ খরা বা শব্দদখলের গরীবীর কারণে ছিটকে গেছেন কবে। তাহলে বিষয় বলতে বাকী রইলো কী?

উত্তরে বলতে হয় মূলত কিছুটা দর্শন - বাহিরি ও অন্তরলীন, সমাজভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা, এক আলগা ইতিহাস বা কালচেতনা ও খুব ওপর-ওপর দেখা সাংস্কৃতিক বিবর্তন। মোটামুটি এইই বাংলা কবিতার চিরাচরিত ভাবনাক্ষেত্র। বড়, কৃতি কবিদের হাতে এইসব ভাবনাক্ষেত্রের এজমালী মাঠ কিছুটা জায়গা বাড়াতে পেরেছে, আর মাঝারিরা খেলার মাঠ কাদা করেছেন বেশি।

একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে এইটুকু 'বিষয়'কেও জলাঞ্জলি দেবার প্রয়াস শুরু হয়। কবিতা কিছু বলবে না, কোনো ভারী কথা নয়, কোনো বক্তব্য নয়, দর্শন নয়, সমাজ-রাজনীতি প্রাবন্ধিকদের ক্ষেত্র হোক; কবিতা ধ্বনি, শব্দ, ভাষা, অক্ষরের নেশায় নিজের আয়নায় নার্সিসাস। তাহলে কীভাবে এই 'শূন্যস্থান' ভরাবে বাংলা কবিতা! দুটো উদাহরণ দেখা যাক দুই অত্যন্ত কুশলী তরুণ কবির কবিতা থেকে -

গাছ চেনার ফাঁকে আলো পড়ছে
পড়ছে, আর উঠছে না
যেমন আউটডোঙার জন্য
নেমে গেলো সাইকেল-সহবাস

তারাদের মধ্যে কেউ মজুমদার
সারারাত ওদের হাঁড়িকুড়ির গান
আমাদের আঙুলে খেলা করে

গাছ সারাইয়ের টুকরো ওড়ে সারারাত
সরাই মানেই তো অপেক্ষা
জানি, বসার জাগার ইচ্ছে হবেই
পায়ের শব্দ শোনার ...

(লাইটহাউস / ইন্দ্রনীল ঘোষ)

একটা বহির্দৃশ্যের ওপর ভর করেই এ কবিতার নির্মান। আসছে গাছের কথা, খোলা মাঠে নেমে যাওয়া সাইকেল, আসছে খোলা আকাশের তারা, সরাইখানার পথমধ্যি সংশ্লেষ, ইত্যাদি। ভ্রমণের ব্যঞ্জনার রেশ কবিতার সর্বত্র রয়ে যায়। কিন্তু কোথাও ওই তিন 'ব' (বর্ণনা-বন্দনা-বিবৃতি)-এর বাড়াবাড়ি নেই। তেমনভাবে কিছু বলার চেষ্টা বা ইচ্ছেও নেই। বুকের গর্ত খোঁড়া নেই, মাথার গর্ত তো নইই। একটা পালকের মতো হাল্কা কবিতাকে ছবির ওপর ভর করেও অত্যন্ত সকৌশলে গড়ে নেওয়া হয়েছে। পরের কবিতায় ভ্রমণ আসে সরাসরি। ট্রেন থেকে দেখা একাধিক দৃশ্য -

ট্রেন থামলো আবার

বনভোজনে সারাদিন দেখেছি ছবি লেখালিখি হয়, ছুটির পিঠ অবধি।
রোদে পোড়া মানুষের যতটা মিলনকলা, শ্যামলী পরবশ, চকিত বেজে
ওঠ। খামোসি কারখানার সুধারাণী বোনে বীজ। একান্ত ক্ষরণ হলেও
মধ্যবর্তী দৃশ্যের বাসমতী। কোথাও অভ্যাস ছাড়ানো, রং পরিবার
ছাড়াই কোথাও ক্রেয়নের পায়রা

(মধ্যবিত্ত সিরিজ ও মুকুল সপ্তাহ/প্রদীপ চক্রবর্তী)

কেবল ছবি, ছবির সারি। কিন্তু গড়পড়তা কবি যেভাবে ছবিটা লিখবেন, এখানে তার চেয়ে অনেক স্বতন্ত্রভাবে লেখা। ভাষার ক্ষমতায় মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। কারখানা এখন বন্ধ হয়ে গেছে, মেয়েটি তাই ক্ষেতে কাজ করে হয়তো, বীজ বোনে - বোঝাতে লেখা হলো, 'খামোসি কারখানার সুধারাণী বোনে বীজ'। অভাব, ক্ষয়ের মধ্যেও বাঙালী পরিবারের স্বাভাবিক শ্রীটুকু আছে যা বোঝাতে 'বাসমতী' শব্দটাকে আনা হলো কাব্যিক কৃতিত্বে। দৃশ্য, ছবি সবই খুব চেনা - বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীণ কি মফস্বলী। কিন্তু এখানেও কবিতা এর বেশি কিছুই বলতে চায় না। বাকতুলির কাজ যেই শেষ, কবিতাও শেষ। ছায়াছবির ক্রমিকের মধ্যে শূন্যতাকেই প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ওপরের দুটো নমুনাতেই ফলস্বরূপ কবিতা যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা লিরিক কবিতা। চলিত লিরিক নয়। আজকের লিরিক- এক আপডেটেড, অনুবর্তিত লিরিক। যা অন্যদেশের কবিতাতেও ধরা পড়ছে। যার আখ্যান নিসর্গ, যার দেখা আপনার চোখের, যার সাঙ্গীতিকতা চলতি ছন্দ, লয় ছেড়ে দিয়ে নতুন ধ্বনি ও মাত্রা-লয়ের খোঁজে। কিন্তু একইসঙ্গে কবিতার খোল খালি। কারো ক্ষেত্রে ভেতরটা ফুরনো, কারো ক্ষেত্রে কোনোদিন ভরাই হয়নি। একটু হাওয়া দিলেই উড়ে বেড়ায়, মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করে। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়।

নতুন শতকের দেড় দশক পেরিয়ে এসে 'একবিষয়ী' একশিলা, মনোলিথিক কবিতার যতোটা বিরোধিতা করবো আজ, ঠিক ততোটাই এই নিসর্গসূত্রী 'বিষয়হীন' কবিতার। অথচ ছবিকে ব্যবহার করার আরো কত রাস্তা আছে। ওপরাংশে আলোচিত জেরেমি প্রিনের কবিতা একটা নমুনা মাত্র। ১৯৬০-এর দশকে ফরাসী সাহিত্যিক রোঁলা বার্থ ছবির ভূমিকা নিয়ে, তাৎপর্য নিয়ে একাধিক লেখা লেখেন।

একটা ভাষিক বার্তার মূলত দুটো দিক থাকে - সাঙ্কেতিক (denotative) ও দ্যোতনিক (connotative)। ছবির বার্তার অলঙ্কারে একটা তৃতীয় গুণ আছে। এক তৃতীয় চরিত্র। এটা কীভাবে গড়ে ওঠে সেটা বোঝাতে বার্থ চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিওলজির দ্বারস্থ হন, স্বভাবতই 'চিহ্ন' (sign), 'গুরু' (signifier) ও 'গুরুত্ব'এর (signified) কথা ওঠে। ছবি স্বভাবই নানা চিহ্নের সমষ্টি, যেমন প্রথম উদ্ধৃত নতুন লিরিকে - গাছ, সাইকেল, তারা, সরাই (ও সারাই); দ্বিতীয় কবিতাংশে - বন্ধ কারখানা, বীজ বোনা, 'বাসমতী' (যাকে আক্ষরিক অর্থে আমি পড়িনি), পায়রা, একটু রঙের সর্বত্র লেগে থাকে ইত্যাদি। এই চিহ্নের ব্যবহারে কিছু নির্দিষ্ট ভাবনার ওপর 'গুরুত্ব' আরোপ করা হয়। প্রথম কবিতায় 'গুরু' হয়তো এক ভ্রাম্য একাকী - আর তাই হয়তো কবিতার শীর্ষক 'লাইটহাউস'। দ্বিতীয় কবিতাংশে গুরু স্পষ্টতই ভ্রমণদেখা। বার্থ বলেন, ছবির বার্তায় এই গুরু ও গুরুত্বে সম্পর্কের আড়ালে এক ধূসর, ক্রমশ বিলীয়মান আত্ম-পরিচিত চলে আসে। ভ্রান্ত পুনরাবৃত্তিকে টপকে যাবার, বা তাকে খন্ডন করার একটা জায়গা থাকে। এক 'উপভাষিকতা' বা metalinguistics এর সম্ভাবনা শুরুর জায়গা। আস্তে আস্তে একটা বার্তা তৈরি হয় যার কোনো কোড বা সূত্র নেই। এখন এই সূত্রহীনতা কী? 'নতুন কবিতা' ধারার কবিদের অনেকে বলবেন - শূন্যতা। অর্থশূন্যতা। মিনিং-প্রোডাকশানের সব রাস্তায় একটা করে নো-এন্ট্রি লাগিয়ে দিয়ে দেখা - এতে কী হয়।

আবার একটা অন্য রাস্তাও আছে। অর্থশূন্যতা তৈরি করতে গেলে নির্দিষ্ট সংকেতকে উৎখাত করতে হয়, বাস্তুহারা। জায়গা খালি হয়। আর খালি জায়গায় এনে ফেলতে হয় অসংখ্য অর্থ, চিন্তাসূত্র, বিষয়ক্ষেত্র, আন্তর্শাখিক ভাবনা, বহু-জ্ঞানশাখিক বা multiepistemological চিন্তাস্রোত। যাকে আমি বলবো - 'পরিবিষয়'। ফলত তৈরি হয় এক অর্থাগম যাকে বার্থের

ভাষায় বলা যায় – an absence of meaning full of all the meanings। তাই চিত্র থাকুক, রূপক থাকুক কিন্তু খুব লুকিয়ে, থাকুক দৃশ্যনেশা; 'স্মরণযোগ্যতা'র অভিধা বদলাক, আর চলুক প্রকৃত 'বিষয়হীন'-এর খোঁজে, তথাগত 'বিষয়হীনতা'র বিরুদ্ধতা – যেখান থেকে 'পরিবিষয়'এর ধারণাজন্ম।

লেখসূত্রঃ

১। POEMS, J. H. Prynne, BloodAxe Books, 1997.

২। Image Music Text, Roland Barthes. Tr. By Stephen Heath, Hill & Wang, New York, 1977.

৩। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দেজ, ১৯৮৪।

৪। উৎপল কুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা; প্রতিভাস, ২০০৪।

৫। দিনগুলি, রাতগুলি, শঙ্খ ঘোষ; দেজ, ১৯৮৪।

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, জুলাই/অগাস্ট ২০১৪